# ‘গণদাবী’—খেটে খাওয়া মানুষের মুক্তি পথপ্রদর্শক

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী এম,এল, এ
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র

৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা | ২৮শে জুলাই ’৫৫ | চার পয়সা

‘গণদাবী’ ৮ম বর্ষে পদার্পণ করল। ’৪৮ এর ২৯শে জুলাইএ ‘গণদাবী’ প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল; ৪৮ সাল—ইতিহাসের পাতায় একটি বিশেষ বছর; বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী হুকুমত্ সবে রূপ পালটেছে—কংগ্রেসের সাথে ইংরেজ সরকারের আপোষের ফলে দেশ ‘স্বাধীন’ হয়েছে, আর কংগ্রেসীরা গদীতে বসেছেন—সেই স্বাধীনতার সবে এক বছর পূর্ণ হয়েছে, এমনি সময়ে ‘গণদাবী’ ২৯শে জুলাইএর সংগ্রামী একতার স্মরণে (’৪৬ এর ঐ দিনে সারা ভারত ডাক ও তার বিভাগের কর্ম্মীদের ধর্ম্মঘটের সমর্থনে দেশব্যাপী শ্রমিক কর্ম্মচারীর অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মঘট) ভারতের ইতিহাসে এক মহাকলঙ্কময় দুর্দিনে গণদাবী আত্মপ্রকাশ করল মহান ব্রত নিয়ে।

সেই প্রতিক্রিয়ার মুহূর্ত্তে ‘গণদাবী’ নবজাতকের মতই প্রথম প্রকাশে সুতীব্র ঘোষণায় পৃথিবীকে জানাল দেশজোড়া চক্রান্তের কথা। প্রতিক্রিয়ার মুখোশ খুলে দিয়ে ‘গণদাবী’ ভারতের জনগণের কাছে জানাল দেশী-বিদেশী ধনিক মালিকদের সেদিনকার গাঁট ছড়ার কুফল, কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা আসার ফলে বাহ্যতঃ সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক শাসনের অবসান হলেও জনগণের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা যা ‘জনগণের হাতে ক্ষমতা’ আসার মধ্যে দিয়ে হতে পারে তা যে ’৪৭ এর ১৫ই আগষ্টে আসেনি একথা ‘গণদাবী’ পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করতে দ্বিধা করল না। দেশীয় ধনিকদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সতর্ক হতে এবং সর্বপ্রকারের শোষণের অবসানের জন্যে ও জনগণের স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে জনগণের সংগঠন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার আবেদন জানাল ‘গণদাবী’। তৎকালীন বামপন্থী দলগুলির দুর্ব্বলতা ও দেউলিয়াপনার বিরুদ্ধেও ‘গণদাবী’ বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলল। ২৯শে জুলাইএর ঐক্যের ঐতিহ্য বহনের সংকল্প নিয়ে ‘গণদাবী’ নিজ বিপ্লবী দায়িত্ব পালনে এগিয়ে চলল।

কিন্তু “গণদাবী” সহায় সম্বলহীন ও কপর্দ্দকশূন্য; মুষ্টিমেয় সমাজ-সচেতন বিপ্লবী মার্ক্সবাদীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় “গণদাবী” তার যাত্রা সুরু ক’রল। অর্থ নেই, সামর্থ্য নেই, নেই নামজাদা কোন তথাকথিত নেতার পৃষ্ঠ পোষকতা—শুধুমাত্র মার্ক্সবাদের শিক্ষায় সমুজ্জ্বল বিপ্লবী চেতনা, সমাজ ও ইতিহাসের সঠিক বিশ্লেষণ ও জনগণের বিপ্লবী ভবিষ্যতের প্রতি অগাধ বিশ্বাস—এইটুকু মাত্র পাথেয় ক’রে “গণদাবী” সম্মুখের বিপুল বাধা ও প্রতিকূল পরিবেশের পথ কেটে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এল। তারপর ধীরে ধীরে সাতটি বছর অতিক্রান্ত হ’য়েছে।

বামপন্থার নামে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি, বিপ্লবের নামে এ্যাডভেঞ্চার, সংগ্রামের নামে হঠকারিতা এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পায়ে ঘৃণ্য আত্মসমর্পণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের বিচ্যুতি যা প্রায় সবগুলি তথাকথিত বামপন্থী এবং মার্ক্সবাদী দলগুলির মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে প’ড়ল “গণদাবী” তাদের সকলের বিরুদ্ধে মতবাদিক ও আদর্শগত সংগ্রাম দৃঢ়তার সাথে চালাতে লাগল। এমনিভাবেই বিগত সাত বছরের ক্রমান্বয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে “গণদাবী” মার্ক্সবাদের বিপ্লবী ধারাকে ও শ্রমিক-শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রেখেছে। আজ এই অষ্টম বর্ষে “গণদাবী”র বিগত সংগ্রামের সাল—তামামীর ক্ষণ উপস্থিত।

’৪৭ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ—আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ‘গণদাবী’ যে সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছিল পরবর্ত্তী ঘটনা ও ইতিহাস তার যথার্থতা প্রমাণ করেছে। ’৪৭ এর ‘স্বাধীনতা’কে আমাদের দেশের কোন কোন রাজনৈতিক দল কোনও সময়ে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে নি। আলোচনা করলে দেখা যাবে যে একমাত্র ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিই এখন পর্য্যন্ত বার কয়েক এই প্রসঙ্গে তাদের ব্যাখ্যা ও নীতি পাল্টাল। প্রথম আমলে মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের খানিক সমালোচনা করলেও মূলতঃ কম্যুনিষ্ট পার্টি ’৪৭এর ক্ষমতা হস্তান্তরকে ‘প্রগতির এক ধাপ’ আখ্যা দিয়েছিল। সেই আমলে (তাদের ’৪৮ দ্বিঃ পাঃ কংগ্রেসের পূর্ব্ব অবস্থা) সরকারের এক অংশের প্রতি বিশেষ করে তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী নেহেরু-পরিচালিত অংশের প্রতি প্যাটেল-চক্রের বিরুদ্ধে পূর্ণ সহযোগিতা জানিয়েছিল।

কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কম্যুনিষ্ট পার্টি এই নীতির পরিবর্ত্তন ক’রে সরকারের বিরোধিতা এমন কি উগ্র হঠকারী নীতি অবলম্বন করল। অথচ সরকার সম্বন্ধে মূল বিশ্লেষণে ঘোষণা করল যে কংগ্রেস সরকার দেশীয় সামন্ততন্ত্র, এক চেটিয়া পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল সরকার এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আদায়ের এই সংগ্রামে উক্ত পার্টি ‘জাতীয় বুর্জ্জোয়াদের সাথে ঐক্যফ্রন্ট’ করার নীতি ও গ্রহণ করল। ’৪৭ এর পরে দীর্ঘ ৭ বছর ধরে কম্যুনিষ্ট পার্টি অবিরামভাবে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের লড়াইএর প্রচার চালিয়ে এল। মাত্র সম্প্রতি কয়েক মাস হ’লো এই বিশ্লেষণের সংশোধনের পর এরা এখন আবার নূতন ভোল নিয়েছে এবং বর্ত্তমানে এদের প্রধান কর্তব্য হয়েছে, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্যে নেহেরু সরকারের সাথে কোনও কোন ক্ষেত্রে’ সহযোগিতা করা।

ভারতীয় বিপ্লবের স্তর নির্ণয়ের ব্যাপারে যেখানে কম্যুনিষ্ট পার্টি বার বার একই অমার্ক্সীয় ভুলের পরিচয় দিচ্ছে সেখানে ‘গণদাবী’ (৭ই নভেম্বর ‘৫২’) লেনিনের উক্তি স্মরণ করছে, “রাষ্ট্র যন্ত্রের প্রশ্নই হচ্ছে যে কোন বিপ্লবের মূল প্রশ্ন” এবং স্তালিনের আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা, “কোন্ শ্রেণী বা শ্রেণীগুলির হাতে ক্ষমতা (রাষ্ট্রিক) কেন্দ্রীভূত, কোন্ শ্রেণী বা শ্রেণীগুলিকে উচ্ছেদ করতে হবে, এবং কোন্ শ্রেণী বা শ্রেণীগুলি ক্ষমতা গ্রহণ করবে—এই হচ্ছে যে কোন বিপ্লবের প্রধান সমস্যা,” তাই ‘গণদাবী’ বলছে “বিপ্লবের স্তর ও সেই স্তরে মূল রাজনৈতিক আওয়াজ (Strategical Slogan). কি হবে তা সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করতে হলে, উপরিউক্ত বিষয়গুলির যথাযথ অনুধাবণ ও বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই একমাত্র সম্ভব।” আরও বলা হয়েছে, “বিপ্লবের স্তর নির্ণয় করার সময় রাষ্ট্র-যন্ত্রের শ্রেণী চরিত্র ও ইহার সাংগঠনিক রূপ বিচারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি চাপা দিলে তা আর যাই হোক শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী বা মার্কস্‌বাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতির পরিচায়ক নয়।”

এই প্রশ্নেরই জবাব হিসেবে ‘গণদাবী’ আবার বলছে—“এই নূতন পরিস্থিতিতে (কংগ্রেসী রাজের পর) ভারতের শ্রেণীগুলি পরিষ্কার দুই ভাগে ভাগ হয়ে পড়েছে। একদিকে শোষকের ভূমিকায় পুঁজিপতি শ্রেণী, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র এবং অন্যদিকে সংগ্রামের ভূমিকায় সর্ব্বহারা শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত। জনতা দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামে শত্রু হিসেবে দেশীয় ধনিকশ্রেণীকে দেখতে পাচ্ছে যার সংগে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের স্বার্থের খাতির মিশে আছে। স্বভাবতঃ জনতার এই সংগ্রাম মূলতঃ পুঁজিবাদ বিরোধী এবং তাই ভারতীয় বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে নিঃসন্দেহে পৌঁছেছে, এ অবস্থায় অর্দ্ধ সমাপ্ত বুর্জ্জোয়া” গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথেই পরিণতি লাভ করবে।”

[ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন ও স্তালিন—৭ই নবেম্বর, ১৯৫৩]

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজগঠন সম্বন্ধে কংগ্রেসের গত আবাদী সম্মেলনের প্রস্তাব দেশের জনসাধারণের মনে নূতন বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ঠিক যেমন ৪৭’এ একদিন হঠাৎ ঘোষণা করা হয়েছিল যে ইংরেজ চলে গিয়েছে, দেশ স্বাধীন হলো—কিন্তু জনতা বুঝতে পারলো না কি করে কোথা দিয়ে স্বাধীনতা হলো, দেশের কোথায় কি কি পরিবর্তন হলো অথচ মনে মনে তবু

(৩য় পাতায় দেখুন)

# গোয়া, দমন, দিউ'র মুক্তি আন্দোলন ও আমাদের কর্ত্তব্য

গোয়া, দমন, দিউ'র মুক্তির প্রশ্ন আজ ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ ও নির্য্যাতনের কবল হইতে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্খায় গোয়া, দমন, দিউ'র জনগণের সাথে ভারতের আপামর জনসাধারণ একাত্মতা অনুভব না করিয়া পারে না।

ভুক্তভোগী হিসাবে ভারতের জনগণ মর্মান্তিকভাবে জানে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পরাধীনতার জ্বালা। ভৌগলিক সীমা রেখার মধ্যে অবস্থিত গোয়া, দমন, দিউ'র সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য ভারতের জনগণ মাত্রই আকুল হইয়া উঠিবে না, তবে এত আন্তরিক আগ্রহ থাকিবে কাহার? তাই গোয়া, দমন, দিউ'র মুক্তির প্রশ্নে ভারতের জনগণের মনে এই আলোড়ন, পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের উৎখাতের আওয়াজ আজ দিকে দিকে বলিষ্ঠ রূপ লইয়া দেখা দিতেছে।

গোয়া, দমন, দিউ'র মুক্তি প্রশ্নকে কোন কোন মহল "রাজনৈতিক মতাদর্শের" ব্যাপার নয় বলিয়া আসল কথাটা চাপিয়া যাওয়ার চেষ্টায় যত্নবান হইয়াছে। ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণীর সেরা মুখপাত্র শ্রী নেহেরু সাংবাদিক সম্মেলন ডাকিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, গোয়ায় আজও পর্ত্তুগীজ শাসন বজায় রাখার চেষ্টা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। বোকামী বহু রকমের হইতে পারে—শ্রী নেহেরু খুলিয়া বলিলেই দেখা যাইত যে তাঁহার মত অনুযায়ী ভারতের পুঁজিপতিদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর না করাকেই "বোকামী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভারতের পুঁজিপতিদের অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ শক্তি-বৃদ্ধির স্বার্থের সঙ্গে ইহা জড়িত থাকা সত্ত্বেও নেহেরুজী সরাসরী কোন পন্থা অবলম্বনের পূর্বে তাহার সাম্রাজ্যবাদী দোসরদের এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবার জন্যই এই টালবাহানা। বৃটিশ শাসকরা ভারতের পুঁজিপতিদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া যে, "সুচতুরতা"র পরিচয় দিয়াছে (যাহার প্রতিদানে কংগ্রেসী শাসক গোষ্ঠী কমনওয়েলথের জোট আজও ধরিয়া আছে), পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীরা যদি সেই পথ অবলম্বন করে তাহা হইলে প্রতিদানে বৃহত্তর স্বার্থের ব্যাপারে ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণী যে তাহাদের আপদে বিপদে সহায়ক হইবে এই কথা বুঝিয়া লইতে দেরী করার জন্যই এরূপ কটূক্তি। ভারতের পুঁজিপতিরা ভাল করিয়াই জানে যে পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদ আজ যে অকথ্য নির্য্যাতন চালাইতেছে তাহার পিছনে "উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থা" (NATO)'র যুদ্ধ জোটের প্রত্যক্ষ প্ররোচনা রহিয়াছে। আর তার চাবিকাঠি স্বয়ং মার্কিণ কর্ত্তাদের হাতে —তাই মার্কিণ কর্ত্তাদের নাড়া দিতে গিয়া কোন বিপাকের সৃষ্টি হইবে কিনা এ সম্পর্কে আজও নিশ্চিন্ত হইতে না পারার অপেক্ষামাত্র।

কিন্তু ভারতের জনগণের কাছে গোয়া, দমন, দিউ'র পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্তির প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে স্বাধীকারের প্রশ্ন। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বেড়াজাল ছিন্ন করিতে না পারিলে জনগণের আকাঙ্খিত মুক্তি আনা সম্ভব নয়, তথা শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না, ইহার সাথে জড়িত রহিয়াছে জনগণের অস্তিত্ব, জীবন ধারণ, জীবনের বিকাশ প্রভৃতি জলন্ত সমস্যা। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী পর্ত্তুগীজ শাসন-শোষণ বজায় থাকিলে বিশ্বযুদ্ধের পাকচক্রে তা অবশ্যম্ভাবীরূপে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ ঘাঁটি রূপে ব্যবহৃত হইবেই—তাই জনগণের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার জন্য ও সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন ভারতের বুক হইতে চিরতরে মুছিয়া ফেলিবার রাজনৈতিক মতাদর্শ উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে গোয়া, দমন, দিউ তথা ভারতের বৃহত্তর জনগণকে।

ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের অন্তরের এই স্বাধীনতা স্পৃহা ও মুক্তি আন্দোলনে সক্রীয় অংশ গ্রহণ, গোয়া, দমন দিউ'র জনগণের মনেও আশার সঞ্চার করিতেছে যে, তাহারা একা নয়—তাহাদের পাশে ভারতের জনসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দাঁড়াইবে, পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের চিরতরে অবসানের জন্য।

ভারতের জনগণ গোয়া, দমন, দিউর মুক্তি আন্দোলনে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সক্রীয়ভাবে সাহায্য করিতে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে নিজেদের মুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা হইতে মুক্তি আন্দোলনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলিয়া ধরা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করে।

প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্তি সংগ্রামের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও গতিপ্রকৃতি সুষ্ঠুভাবে নিজেদেরই পর্য্যালোচনা করিয়া লইতে হইবে। ভারতের জনগণ বিগত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় এই প্রশ্নের মিমাংসায় উপনীত হইতে না পারায়, (তদকালীন বামপন্থী দল সমূহের আদর্শগত সংগ্রাম ও নেতৃত্বের দেউলীয়াপণা এবং তালবাহানার পরিণতিতে) অন্যদিকে শুধুমাত্র "বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অবসানের" উদ্দেশ্যে নিজেদের আদর্শগত দিক হেলায় হারাইয়া আজ দেশীয় ধনিক মালিক শ্রেণীর শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হইতেছে। আন্দোলনের সূত্রপাতেই জনসাধারণকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের অবসান চাই, জনগনের নিজস্ব সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার জন্যই। আর জনগণের সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার প্রথম পাদক্ষেপ হিসাবেই সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের অবসান ঘটানো একান্তভাবে অপরিহার্য্য। কিন্তু পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদ খতম হইলেই জনগণের সমস্ত মৌলিক সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে যতদিন ধনিকতন্ত্র বজায় থাকিবে—ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতীক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ার তথা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই "মুক্তি আন্দোলনের" সম্পূর্ণতা ও সফলতা অর্জন বাস্তবে সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। গোয়া, দমন. দিউর জনগণ নিজেদের মুক্তি আন্দোলনের আদর্শ হিসাবে জনগণের রাষ্ট্র ও সমাজ তথা সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রথম বাধা পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণের অবসানের উদ্দেশ্য যত গভীরভাবে উপলব্ধি করিবে, আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ততই নিজেদের কাছে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিবে—কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষেই তাকে মোহগ্রস্থ করিয়া রাখা সম্ভব হইবে না

দ্বিতীয়তঃ মুক্তি আন্দোলনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার সাথে নিজস্ব সংগ্রামী সঙ্ঘবদ্ধতার উপর জোর দিতে হইবে সমানভাবে। সংগ্রামী সংগঠন ব্যতিরেকে যেমন সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি পরবর্ত্তী ধাপে জনগণের সংগ্রামী সংগঠন শক্তিশালী না থাকিলে যে কোন প্রতিক্রিয়ার পদতলে অসহায়ভাবে আত্ম সমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তখন আবার নূতনভাবে সংগ্রামী চেতনার সঞ্চার—সংগঠনের গোড়াপত্তন এবং সংগ্রামের মহড়া দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার ভারতীয় জনগণের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ গোয়া, দমন, দিউ'র জনগণকে নিজেদের মুক্তির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও স্বার্থের সাথে দেশীয় ধনিক মালিক জমিদার মহাজনদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও স্বার্থের স্বতন্ত্ররূপ কোন সময়ের জন্যই ভুলিলে চলিবে না।

চতুর্থতঃ জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় দেশীয় ধনিক শ্রেণীর প্রতি আচরণ সংগ্রামী কৌশলগত দিক হইতে বিচার করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ বর্ত্তমান ভারতবর্ষের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে মোহমুক্তি ঘটাইতে হইবে। যে মোহের দরুণ ভারতের জনগণ একদিন জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণ পন্থী (বর্ত্তমান শাসক গোষ্ঠী) নেতৃত্ব সম্পর্কে, তাহাদের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণে ও অনুধাবনে বিরত থাকিয়া—ক্ষমতার গদীতে বসাইবার সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট ধাক্কা খাইয়া আজ মর্মে মর্মে অনুধাবন করিতেছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধনিক শোষণের স্বাদ। গোয়ার জনগণকেও এই হুসিয়ারী লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে দৃঢ় পদবিক্ষেপে।

উপসংহারে একথা সুস্পষ্টভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, গোয়া, দমন, দিউ'র জনগণের পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্তির সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের অবসান ঘটাইয়া বৃহত্তর ভারতের জনগণের বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজের সমাধি রচনার আন্দোলনের এক অবিচ্ছিন্ন

(৪ র্থ পাতায় দেখুন)

## সংস্কারবাদ, পার্লামেণ্টারী মোহ ও নেহেরু স্তুতির বিরুদ্ধে

# গণদাবীর বিপ্লবী আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করুণ

( ১ম পাতার পর )

একটা আশার সঞ্চার হলো বুঝি বা এতদিনে সর্বদুঃখ ঘুচবে। সেই আশার জের কিছুদিন রইলো, কিন্তু অচিরেই সমস্ত আশা মোহ ভেঙ্গে গেল কঠিন আঘাত খেয়ে—কংগ্রেসী দুঃশাসনে। তেমনি আবাদির প্রস্তাব আবার নূতন মোহ সৃষ্টি করল—সন্দেহ থাকলেও যেন মনে হচ্ছে যে নেহেরু এবার কিছু একটা করবে। জনতার মনে এই মোহ দোদুল্যমানতা বা অস্পষ্টতা দূর করাই হচ্ছে বিপ্লবী দলের কাজ শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী নেতার দায়িত্ব। অথচ আমাদের দেশে ঘটল তার বিপরীত। বিভিন্ন বামপন্থী দল ও নেতারা যেন হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল। কোন্ কোন ঝানু নেতা যারা এতদিন শ্রমিক বিপ্লবের কথা বলে দেশ মাত করছিল তারা যেন এতদিনে আলো দেখতে পেলো—নেহেরুজীর কোলে আশ্রয় নিয়ে বিপ্লবের ঝামেলা এড়িয়ে রাতারাতি সমাজতন্ত্র গঠনের পথ পেয়ে গেল। কোন কোন দল ( পি, এস, পি ; সি পি, আই ) হিসাব করতে বসলো সরকারের সাথে এখন কোথায় কোথায় সহযোগীতা করা যায় আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিরোধিতা করা চলে। আবার কেউ বা অত মাথা ঘামাবার কষ্ট না করে শুধু এটা একটা ধাপ্পা বলেই কাজ শেষ করল। ফলে জনতা হলো আরও বিভ্রান্ত।

এমনি অবস্থায় "গণদাবী" ধীর ভাবে বলল "একদিকে কংগ্রেসী সরকারের বহু বিঘোষিত বৈদেশিক নীতি, পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা' চৌ-নেহেরু চুক্তি, সর্ব্বোপরি জহরলাল ঘোষিত 'সমাজতন্ত্র" প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে "জাতীয় ঐক্য ( আবাদীর প্রস্তাব) গঠনের আওয়াজ অপর দিকে রাজনৈতিক আসর হইতে ছোট বড় রাজনৈতিক দলের বিদায় গ্রহণ, এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের আওয়াজ ও জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে আঁতাতের নীতি জনসাধারণকে এক চূড়ান্ত বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। ( কংগ্রেসী সমাজতন্ত্র—১৫ই জানুয়ারী, শনিবার '৫৫)। শুধু সমস্যার গুরুত্ব স্বীকার করেই 'গণদাবী' ক্ষান্ত রইলো না। পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করল যে, "পুঁজিপতি শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত না করিয়া এবং উহাদের মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে শোষনের পুরাপুরি অধিকার বজায় রাখিয়া, দেশের চাষীর হাতে উপযুক্ত পরিমাণ জমি বন্টন করিয়া দিবার কোন কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ না করিয়া, বিদেশী পুঁজিপতিদের ভারতবর্ষের জনসাধারণকে শোষণ এবং ভারতের বাজারে প্রতিযোগীতার পথ বন্ধ না করিয়া, ক্রমাগত কিছু-সংখ্যক লোকের হাতে জমি একেন্দ্রীকরণের পদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়া ভারতীয় একচেটে পুঁজির বিদেশের বাজার দখলের সাম্রাজ্যবাদী নীতি অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া সর্ব্বোপরি পুরাণ শাসন ও শোষণযন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকেই শুধু নেহেরুজীর আবোল-তাবোল বাগাড়ম্বরের জোরেই কংগ্রেস সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে বলিয়া প্রচার চালাইতেছে। একমাত্র অন্ধ ও মতলববাজ ব্যাক্তিরা ছাড়া আর কাহারো পক্ষেই ইহার স্বরূপ চিনিয়া লওয়া কঠিন নয়। (সেই সংখ্যা)।

আবাদীর 'সোস্যালিষ্ট প্যাটার্ণ অব সোস্যাইটি' প্রস্তাবের মতই, নেহেরুজীর বৈদেশিক নীতিও দেশবাসীর মনে বেশ খানিকটা আসর জমিয়েছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। নেহেরুজী আজ প্রায় শান্তির প্রধান দূত হয়ে দাড়িয়েছেন—বুর্জোয়া রাজনীতি ও প্রচারযন্ত্রের কল্যাণে। আর এ ব্যাপারেও তাঁকে সাহায্য করার কাজে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি। মাত্র কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট পার্টি নেহেরুকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল—শান্তির শত্রু প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছে—কিন্তু ধীরে ধীরে নেহেরুর বৈদেশিক নীতির কোন কোন অংশ সমর্থন করে শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে 'শান্তির প্রতিক' এবং তাঁর বৈদেশিক নীতির প্রায় পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে কম্যুনিষ্ট পার্টি।

এতদিন কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর কথা বলেছে ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল নেহেরু সরকারের উচ্ছেদ করে জাতীয় স্বাধীনতা আদায়ের কথা বলেছে, আর আজ নেহেরুর বৈদেশিক নীতিকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে ও আবাদীর 'সোস্যালিষ্ট প্যাটার্ণ অব সোসাইটি'কে এখানে ওখানে সমর্থন জানিয়ে "জাতীয় স্বাধীনতা", "সার্ব্বভৌমত্ব" রক্ষার মহান কর্ত্তব্য নিয়েছে। পণ্ডিতজী বলছেন কম্যুনিষ্ট পার্টি নাকি নীতি বদলিয়েছে আর এরা পাল্টা বলছে যে কম্যুনিষ্ট পার্টি তার নীতি বদলায়নি আসলে নাকি পণ্ডিতজীই অনেক বদলে গেছেন। মাঝখানে পড়ে জনসাধারণ বোকা বনছে। কাকে সমর্থন করবে—কোথায় সমর্থন করবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

এ অবস্থায়ও 'গণদাবী' দায়িত্ব পালনে পেছপা হয়নি। ১৯৫১ সালের ১৯ই আগষ্টের "গণদাবী" নেহেরু সরকারের বৈদেশিক নীতির আলোচনা করতে গিয়ে বলছে—"ভারতের বাইরে অপরাপর দেশের বাজার দখলের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে এশিয়ার ছোট ছোট পুঁজিবাদী দশগুলিকে নিয়ে ভারতবর্ষ আজ নূতন একটি রাজনৈতিক জোট গড়ে তোলার আশা করছে ".....

... "ভারতীয় পুঁজিপতিদের বিদেশে বাজার দখলের এই লালসাই নেহরু সরকারের কখনো মার্কিণ-বিরোধী কখনো বা সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতির জন্মদাতা। কাজেই নেহেরু প্রয়োজন মত কখনো কখনো দেশী ও বৃটিশ পুঁজির স্বার্থে একচেটিয়া মার্কিণ পুঁজির সংগে প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে অর্থাৎ মার্কিণ বিরোধিতা করছে ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংগে বন্ধুত্ব রক্ষা করছে, অপরদিকে দেশীয় পুঁজিবাদের প্রসারের স্বার্থে এবং ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠির একজন ছোট অংশীদার হিসাবে প্রয়োজন মত সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত মূলনীতিগুলি ও সর্ত্তগুলির সংগে আপোষ রক্ষা করে চলেছে এবং ভারতবর্ষকে এখনও বৃটিশ কমনওয়েল্থের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে।"

এই প্রসঙ্গেই 'গণদাবী' আবার বলছে. "নেহেরু সরকার ভারতবর্ষের দেশী পুঁজিপতী শ্রেণীর প্রতিনিধি—...মার্কিণ পুঁজিবাদের সংগে ভারতের পুঁজিবাদের বৃহত্তর স্বার্থের দিক দিয়ে কোন মূলগত পার্থক্য নেই ..... কিন্তু ভারতীয় পুঁজিপতিরা আবার প্রচুর মুনাফা কামাবার স্বার্থে স্বাধীন-ভাবে ব্যবসা করার পক্ষপাতী এবং মার্কিণ পুঁজিবাদের দাসত্ব করতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। সেদিক থেকে সর্ব্বগ্রাসী একচেটিয়া মার্কিণ পুঁজির সংগে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ-বিরোধ।"

কংগ্রেসী সরকারের যে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা খসড়া প্রস্তাবাকারে সবেমাত্র বেরিয়েছে এবং তা নিয়ে এর মধ্যে দেশের বিভিন্ন মহলে জল্পনাকল্পনা সুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে সুরু করে প্রাদেশিক সরকারগুলো এবং নামজাদা বিজ্ঞানীরা পর্য্যন্ত এই পরিকল্পনার উপর যার যার মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বা তাতে সমাজতন্ত্রী ভারত গঠনের নক্শা দেখতে পাচ্ছেন, কেউ এখানে ওখানে ভালো আর কোথাও কোথাও মন্দ বলেই মন্তব্য শেষ করেছেন। কিন্তু একটা মূল বিষয়ে প্রায় সবাই চুপ করে আছে। "গণদাবী" ৮ই জুন' ৫৫ এবং ৯ই জুলাই '৫৫ এর তারিখের সংখ্যা দুটিতে এই পরিকল্পনার উপর আলোচনা সুরু করেছে। "গণদাবী" আলোচনায় একটি মূল প্রশ্নে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং বলছে যে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই শ্রেণী ভিত্তিক দৃষ্টি ভঙ্গীর উর্দ্ধে নয় এবং তাই পরিকল্পনা বিচারের মূল মাপকাঠি হওয়া উচিত-তা কোন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করবে এবং কোন শ্রেণীর দৃষ্টি ভঙ্গীতে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলবে। এই মূল প্রশ্নে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে মন্তব্য করছে যে, ২য় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় অনেক কথা আলোচনা করা হলেও শেষ পর্য্যন্ত বুর্জোয়া অর্থনীতিরই পুরোনো প্রচেষ্টামাত্র, এই পরিকল্পনা স্বভাবতই বিভিন্ন দ্বন্দ্ব এড়াতে পারেনি—ভারী শিল্পের heavy industry ) বিকাশ, ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার তথা চাষীর হাতে জমি পুনর্বণ্টন, জনতার ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা, বিদেশী পুঁজির আধিপত্য বন্ধ করা ইত্যাদি না করতে পারলে বর্তমান যুগে কোন দেশই আর্থিক ও শিল্পক্ষেত্রে প্রসার লাভ করতে পারেনা। অথচ কংগ্রেসী সরকার দেশ গঠন ও সমাজতন্ত্রী ধাঁচের সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা বললেও আসল পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রেও ভীষণ রকমের দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়' এই পরিকল্পনার আরেকটী মারাত্মক দিক সম্পর্কে "গণদাবী" সময়োচিত হুসিয়ারী দিয়ে বলেছে যে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করা ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের দ্বারা ভারতের বাজারে এমন কি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারেও ভারতীয় পুঁজী প্রসারের উদ্দেশ্যই এই পরিকল্পনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এর ফলে ভারতে অদূর ভবিষ্যতে ফ্যাসিবাদ বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে।

"গণদাবী" তার অষ্টম বার্ষিকীতে নূতন করে আবার সঙ্কল্প নিচ্ছে তার বিপ্লবী দায়িত্ব প্রতিপালনের! 'গণদাবী' তার পাঠক পাঠিকা সমালোচক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে, এই মহান বিপ্লবী সংগ্রামে সমস্ত রকমের সহযোগিতার আবেদন জানাচ্ছে।

## কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠকগণ জুরীর বিচারে খালাস

গত বাং ১৩৬০ সালের চৈত্র মাসের শেষভাগে মথুরাপুর থানার অন্তর্গত কঙ্কণদিঘীর কৃষক ও ক্ষেত-মজুর ফেডারেশনের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড বাণেশ্বর জানা ও স্থানীয় কর্ম্মী সুধীর মণ্ডল ও হেমন্ত জানাকে এক সসস্ত্র ডাকাতী ও কৃষ্ণপ্রসাদ দাসের হত্যার অভিযোগ লিপ্ত করা হয়। সেই মোকদ্দমায় ডায়মণ্ডহারবারের ম্যাজিষ্ট্রেট কমরেড, বাণেশ্বর জানা প্রমুখকে মুক্তি দেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে দায়রায় সপর্দ্দ করা হইলে আলিপুরের এ্যাসিষ্ট্যান্ট সেশনজজ গত ২৭শে জুলাই জুরীদের সহিত একমত হইয়া তিনজনকেই মুক্তি দেন।

তেভাগা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে হয়রানীর জোতদারী চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল।

# সত্যাগ্রহ নয়, সক্রিয় গণ আন্দোলনই গোয়া সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ

( ২য় পাতার শেষাংশ )

অঙ্গ হিসাবেই উত্তরোত্তর ভারতের জনগণের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া আগাইয়া যাইতে হইবে—দেশীয় ধনতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সমগ্র ভারতে শ্রেণীহীন, শোষণহীন রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ার লৌহদৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রাসঙ্গিক দিক সম্পর্কে গোয়া, দমন, দিউ'র তথা ভারতের জনগণের দৃষ্টি যুগপত জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। একথা বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন নাই যে গোয়া, দমন, দিউ ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ভাবে বৃহত্তর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বা অংশ বিশেষ। ইহা ছাড়াও গোয়া, দমন, দিউ'র জনগণের পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাইয়া রাজনৈতিক দিক হইতেও ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছাড়া গত্যান্তর নাই। কিন্তু এই ভারতভুক্তির অর্থ ভারতের জনগণের কাছে যা, ভারতের বর্ত্তমান শাসক গোষ্ঠীর তা নয়। অথচ শাসক গোষ্ঠীও গোয়া, দমন, দিউ'র ভারতভুক্তির প্রশ্নে কোন দিক হইতেই কম স্বার্থ সম্পন্ন বা উৎসাহী নয়। এখানে দেখিতে হইবে যে ভারতের বর্ত্তমান শাসক গোষ্ঠীর আকাঙ্খানুযায়ী গোয়া, দমন, দিউ'র ভারতভুক্তি হইলে দেশীয় ধনীক-মালিক শ্রেণীর বাজারের প্রসার তথা শোষণের ক্ষেত্র বৃদ্ধির ফলে দেশীয় ধনিক শ্রেণীকে আরও সুসংবদ্ধ হইতে একান্ত ভাবে সাহায্য করিবে। প্রতিদ্বন্দ্বি অন্যান্য ধনিক বা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র কোন নীতির দোহাই তুলিয়াই তাহা বন্ধ করার যুক্তি পাইবে না। এইদিক হইতে প্রতিকূলতা খুবই কম এবং ভারত সরকার এই পথ বাহিয়াই একটি প্রথম শ্রেণীর ধনিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন সফল করিতে চায়। তাই কংগ্রেসী সরকারের ধীরে সুস্থে কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করিয়া এবং প্রয়োজন বোধে সরাসরি সামরিক অভিযান চালাইয়া গোয়া, দমন দিউ'র ভারত অন্তর্ভুক্তি সমাপণ করিবার উদ্যোগের উদ্দেশ্য, স্বার্থ ও সুদূর প্রসারী অভিসন্ধির কথা বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। ভারত সরকারের গোয়ার ভারত ভুক্তির "জাতীয় উদ্দেশ্য স্বার্থ ও অভিসন্ধির" সঙ্গে গোয়া, দমন, দিউ'র জনগণের কোন সম্পর্ক নাই, থাকিতে পারে না। তাহারা যখন ভারতভুক্তির আকাঙ্খা প্রকাশ করে এবং ভারতের জনগণও যেমন তাহাদের সাথে এক হইতে চায় তাহার অর্থ সোজাসুজি জনগণের অভীষ্ট রাষ্ট্র ও সমাজ তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। এই ধারণা ও জনগণের আত্মপ্রত্যয় এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া গিয়া বা আন্দোলনের কোন পর্য্যায়েই তাহার গুরুত্ব লঘু করিয়া দেখিতে গিয়া গোজামিল দেওয়ার অন্য অর্থই হইতেছে ভারত ও গোয়া, দমন, দিউর জনগণের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া ভারতের জনগণ অগ্রসর হইতেছে গোয়া, দমন দিউর মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিতে, এবং গোয়া দমন, দিউর জনগণকেও এক্ষেত্রে পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে মুক্তি তথা ভারতভুক্তির জন্য তাহাদের আদর্শ উদ্দেশ্য ও গতি-প্রকৃতি ভারতের রাষ্ট্র নায়ক পুঁজিপতি শ্রেণীর দিকে, না বৃহত্তর ভারতের জনগণের সংগ্রামের পার্শ্বে স্থান করিয়া লইবে।

গোয়া, দমন, দিউর মুক্তি তথা ভারতভুক্তির আওয়াজ সার্থক করিয়া তোলার জন্য প্রতিটি বামপন্থী দলের দায়িত্ব কম নয়। মুক্তি আন্দোলনে অংশ নেওয়ার সময় এই বিশ্লেষণ সামনে রাখিয়া নীতি নির্দ্ধারিত ও কার্য্যক্রম গ্রহণ করিলে দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখিয়া সংগ্রামী নীতি ও কার্য্যক্রমের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী মোর্চ্চা গড়িয়া তোলা'র আহ্বান আজ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে।

সক্রীয়ভাবে ও গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গোয়া, দমন, দিউর মুক্তির জন্য যে রাজনৈতিক সচেতনতা গড়িয়া তোলা প্রয়োজন, জনগণের বিন্যাস অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগঠন গড়িয়া তোলা অত্যাবশ্যক এবং বৃহত্তর ভারতের জনগণের সক্রীয়ভাবে আন্দোলনে অগ্রসর হওয়ার জন্য যে অধ্যবসায় অবশ্যম্ভাবি—ইহার দায়িত্ব এড়াইয়া ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত "সত্যাগ্রহের" মারফৎ "বীরত্বের দৃষ্টান্ত" স্থাপন করা যাইতে পারে কিন্তু গণ-আন্দোলনের ব্যাপ্তি, শক্তি ও সামর্থ্য হারাইয়া সর্বোপরি পুঁজিপতি শ্রেণীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় "চাপ সৃষ্টি"তে পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য।

গোয়া, দমন, দিউর মুক্তি সংগ্রামকে সফল করিয়া তোলার জন্য জনসাধারণকে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অভিমত লইয়া আগাইয়া আসার দায়িত্ব লইতে হইবে। গোয়া মুক্তির সমর্থনে জনমত জাগ্রত ও সংগঠিত করার জন্য সমস্ত কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করিয়া নিজস্ব সংগঠনের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া জনগণকে সক্রীয়ভাবে আগাইয়া আসিতে হইবে।

পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের সমাধি রচনার কাজে গোয়া, দমন, দিউ'র জনগণের পাশে দাঁড়াইবার জন্য, ভারতের জাগ্রত, সংঘবদ্ধ, সংগ্রামী জনগণের গণআন্দোলনের জোয়ারের সামনে পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদ কোন্ ছাড় দুনিয়ার কোন প্রতিক্রীয়াশীল শক্তিই দাড়াইবার ক্ষমতা রাখে না। গোয়া দমন, দিউর মুক্তির পথ প্রশস্ত হোক; গোয়া, দমন, দিউর স্বাধীনতা দীর্ঘজীবি হউক; বৃহত্তর ভারত ও গোয়া দমন দিউর মুক্তি সংগ্রাম ঐক্যবদ্ধ হউক। বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক।

## কানপুর ধর্মঘটের শিক্ষা

কানপুর বস্ত্র শিল্পের সাধারণ ধর্ম্মঘট প্রায় ৮০ দিন চলার পর গত ১৯শে জুলাই প্রত্যাহার করা হয়। এই ধর্ম্মঘটে ৪৬ হাজার শ্রমিক এবং তাহাদের সাথে প্রায় ৫ হাজার চটকল শ্রমিকও যোগদান করে। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই ধর্ম্মঘট একদিকে শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম অন্যদিকে আন্দোলনের নেতৃত্বের চরম দুর্বলতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বিখ্যাত থাকবে। ধর্ম্মঘটীদের মূল দাবী ছিল কানপুর বস্ত্রশিল্পে র‍্যাশানালাইজেশন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে। কিন্তু যে সর্ত্তে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয় তাতে শ্রমিকদের কোন দাবী মেটেনি। উপরন্তু ধর্মঘটের পূর্বে র‍্যাশনালাইজেশনের যে নীতি কার্য্যকরী করা হচ্ছিল তাই সর্তের কথার মারপ্যাচের মারফত মেনে নেওয়া হয়েছে। সর্ত্তগুলি আলোচনা করলেই বুঝা যাবে।

যে ১৪ দফা সর্ত্তানুযায়ী ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করা হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি দফা উল্লেখযোগ্য—

১। শ্রমিকদের কাজের পরিমাণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসাব করার জন্য সরকার কর্ত্তৃক গঠিত একটি কমিটির নিকট প্রেরণ করা হইবে। উক্ত কমিটি নৈনিতাল সম্মেলনে শ্রমিকদিগকে যে ৬ দফা গ্যারান্টি দেওয়া হইয়াছে এবং মুখ্যমন্ত্রী পরে যে সমস্ত গ্যারান্টি দিয়াছেন সে অনুসারে কাজ করিবে। ২। শ্রম কমিশনার মিল মালিকদের সহিত কানপুর কাপড়ের কল, মুইরমিল, স্বদেশী মিল এবং কানপুর কটন মিলের যে সমস্ত শ্রমিককে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে তাহাদের ক্ষতিপূরণ দানের বিষয় আলোচনা করিবেন। ৩। ৯ ঘন্টা শিফ্ট প্রবর্তনের প্রস্তাব কমিটি বিবেচনা করিবেন। ৪। এই কমিটির সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী না হওয়া পর্য্যন্ত কোন মিলে র‍্যাশনালাইজেশন চালু করা হইবে না। ৫। পাট কলের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী নির্দ্ধারণের প্রশ্নটি সরকার সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন। কিন্তু উপরোক্ত চুক্তিগুলি মালিক মানিতেও পারে নাও মানিতে পারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

(যুগান্তর ২০শে জুলাই)

১নং সর্ত্তানুসারে নৈনিতাল কন্ফারেন্সে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তাকেই মূলতঃ মেনে নেওয়া হয়েছে। র‍্যাশনালাইজেশন কার্য্যকরী করার জন্য পি, এস, পি নেতা আচার্য্য নরেন্দ্র দেবের প্রস্তাব মত একটি যুক্ত কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি সরকার নিযুক্ত করবেন। ইহা কানপুর, বোম্বে, এবং আমেদাবাদ মিল মালিকদের প্রতিনিধি ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিয়ে গঠন করা হবে। পূর্বে যেখানে কানপুর মিল মালিকরা নিজেরাই র‍্যাশনালাইজেশন চালু করছিল তার পরিবর্তে এই কমিটি র‍্যাশনালাইজেশন চালু করবে, এইটুকু মাত্র পরিবর্তণ করা হয়েছে। র‍্যাশনালাইজেশন যখন যেখানে যে ভাবেই চালু করা হক না কেন, শ্রমিক ছাঁটাই অনিবার্য্য ভাবে সেখানে হবে। ৪র্থ চুক্তিতেবলা হচ্ছে কমির্টির সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী না হলে র‍্যাশানালাইজেশন চালু করা হবে না, অথচ ধর্মঘটের পূর্বে র‍্যাশানালাইজেশনের ফলে যে সমস্ত শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছিল দ্বিতীয় চুক্তিতে তাদের পুনর্বহালের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ধর্মঘট চলাকালীন মালিক পক্ষ ৩০ ভাগ র‍্যাশানালাইজেশন করেছে এবং এর ফলে সমস্ত শ্রমিকরা ফিরে এলেও সবাই কাজ পাবে না এবং চুক্তিতে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যাতে সমস্ত শ্রমিককেই পুনরায় কাজে বহাল করা হবে। কাজেই র‍্যাশানালাইজেশন চালু হবে না বলে যে কথা বলা হচ্ছে তা কি নিতান্ত হাস্যকর নয়? এমন কি কাজের সময় সম্পর্কেও মালিক গোষ্ঠী তাদের পূর্ব নীতি ৮ ঘন্টার পরিবর্তে ৯ ঘন্টার কথাই বলছেন। চটকল শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী বৃদ্ধি পাবে কি না, সে সম্পর্কেও কোন আশ্বাস দেওয়া হয়নি। অথচ এই অবস্থাতে পি, এস, পি, কম্যুনিষ্ট পার্টি আই, এন, টি,ইউ, সি নেতৃবৃন্দ ধর্মঘটকে যে ভাবে পরিচালনা করেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত তা প্রত্যাহার করেছে তা কার্য্যতঃ শ্রমিক স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়েছে।

র‍্যাশানালাইজেশনের নীতি শুধু একটা বিশেষ স্থানের সাধারণ দৈনন্দিন বেতন বৃদ্ধির দাবী নয়, র‍্যাশনালাইজেশন চালু হলে প্রতিটি শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণী ও জনসাধারণের আয়ের মান ক্রমাগত কমতে থাকবে। কাজেই ব্যাপক রাজনৈতিক সংগ্রাম ব্যতীত এই নীতিকে বানচাল করার চেষ্টা বিশ্বাসঘাতকরাই নামান্তর। কানপুরের শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব সবসময়েই চেষ্টা করেছে আন্দোলনকে অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে। কানপুরে যেখানে মালিক, পুলিশ, মিলিটারী এবং মালিক শ্রেণীর মুখপত্রগুলি একযোগে এই নীতি কার্য্যকরী করতে বদ্ধপরিকর তখন দেশ জোড়া ব্যাপক গণআন্দোলন সৃষ্টি না করার ফলে শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সত্ত্বেও এই আন্দোলন বিফল হতে বাধ্য হল।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ্র কর্ত্তৃক ১৩ নং ডিক্সন লেন ...